بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪ মোতাবেক ২৭ ফাতাহ্, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজও কতিপয় অভিযানের উল্লেখ করব। ইতিহাসে একটি অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায় যেটিকে যায়েদ বিন হারেসার অভিযান বলা হয়। এই অভিযান ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল আখেরা মাসে বনু জুযাম অভিমুখে হিসমায় সংঘটিত হয়। হিসমা বনু জুযাম এর একটি শহর ছিল আর মদীনা থেকে আট রাতের দূরত্বে অবস্থিত ছিল। সেই যুগের সফরের একক অনুযায়ী আট রাতের পথ বেশ দীর্ঘ সফর ছিল।

আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম যাদুল মাআ'দ-এ বলেছেন, এই অভিযান নিঃসন্দেহে হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা অর্থাৎ সপ্তম হিজরী সনের ঘটনা। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন:

এই অভিযানের তারিখ সম্পর্কে দ্বিমত রয়েছে, যার উল্লেখ করা আবশ্যক। ইবনে সা'দ এবং তার অনুসরণে অন্যান্য জীবনীকারেরা এই অভিযানের তারিখ ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল আখেরা উল্লেখ করেছেন আর এটিকেই সঠিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম যাদুল মাআ'দ-এ ব্যাখ্যা করেছেন, এই অভিযান সপ্তম হিজরী সনে হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে সংঘটিত হয়েছিল। আর সম্ভবত ইবনে কাইয়্যিমের ভাষ্যানুসারে এই অভিযানের কারণ হিসেবে এটি বর্ণনা করা হয় যে, দিহইয়া কালবী রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ শেষে মদীনায় ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে বনু জুযাম তাকে লুণ্ঠন করে। এটি স্বীকৃত বিষয় যে, মহানবী (সা.) দিহইয়াকে রোমসম্রাটের কাছে পত্র দিয়ে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর প্রেরণ করেছিলেন। তাই এই ঘটনা কোনোভাবেই হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বের হতে পারে না। এই যুক্তি নিজ সত্তায় পুরোপুরি পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট আর এর আলোকে ইবনে সা'দের রেওয়ায়েত নিশ্চিতভাবে অগ্রহণযোগ্য আখ্যায়িত হয়; কিন্তু তিনি (রা.) লেখেন, আমার মতে একটি ব্যাখ্যা এমন রয়েছে যেটিকে আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম উপেক্ষা করে গেছেন। তা হলো, খুব সম্ভব রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাতের জন্য দিহইয়া দুইবার সিরিয়া গিয়েছেন। অর্থাৎ প্রথমবার তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্বে নিজে থেকেই ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে গিয়ে থাকবেন আর রোমসম্রাটের সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন। আর দ্বিতীয়বার হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.)-এর পত্র নিয়ে গিয়ে থাকবেন। আর মহানবী (সা.) তাকে রোমসম্রাটের প্রতি বার্তাবাহক হবার জন্য এই কারণেই নির্বাচিত করেছেন কেননা তিনি পূর্বে রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। এই ব্যাখ্যার সমর্থন এভাবেও হয় যে, ইবনে ইসহাক লিখেছেন, এই সফরে দিহইয়ার কাছে বাণিজ্যিক পণ্য ছিল। আর হুদাইবিয়ার সন্ধির পরের সফরে বাহ্যত ব্যবসায়িক পণ্যের সম্পর্ক দেখা যায় না। এটিও হতে পারে, দিহইয়ার এই সফর কেবল ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে হয়েছে আর ইবনে সা'দ-এর বর্ণনাকারী তার অন্য সফরের সাথে এই সফরকে গুলিয়ে ফেলেছেন এবং রোমসম্রাটের সাথে সাক্ষাৎ ও পোশাকের উল্লেখকে ধারণার বশে (এর সাথে) অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রকৃত বিষয় আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন।

এই যুদ্ধাভিযানের অবস্থা এবং ঘটনাবলি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, রিফা'আ বিন যায়েদ জুযামী স্বজাতির লোকদের কাছে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর পত্র নিয়ে আসেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। সেসময়ে হযরত দিহইয়া বিন খলীফা কালবী রোমসম্রাটের কাছ থেকে ফিরে আসছিলেন। তাকে মহানবী (সা.) রোমসম্রাটের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। রোমসম্রাট তাকে বাদশাহী পোশাক প্রদান করেন আর রাজকীয় পোশাক পরিধান করান। পথিমধ্যে তার সাথে হুনায়েদ বিন অওস এবং তার পুত্র অওস বিন হুনায়েদ-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। ইবনে সা'দ এর মতে হুনায়েদ বিন আরেয এবং তার পুত্র আরেয বিন হুনায়েদ সুলাঈ-র সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সুলাঈ হলো জুযাম গোত্রের একটি শাখা। তারা উভয়ে আক্রমণ করে হযরত দিহইয়ার কাছ থেকে সবকিছু ছিনিয়ে নেয় আর একটি পুরোনো কাপড় ছাড়া তার কাছে কিছুই বাকি রাখে নি। এ সংবাদ বনু যুবায়েব-এর নিকট পৌঁছে, যা ছিল রিফা'আ বিন যায়েদের গোত্র। এ গোত্রটি ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এই গোত্রের লোকেরা হুনায়েদ ও তার পুত্রের উদ্দেশ্যে বের হয়। তারা এই দুইজনের সাথে লড়াই করে আর হযরত দিহইয়ার পণ্য উদ্ধার করে। হযরত দিহইয়া মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন এবং তাঁকে (সা.) এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন আর মহানবী (সা.)-এর নিকট হুনায়েদ ও তার পুত্রের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের আবেদন জানান। মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে পাঁচশত লোক দিয়ে প্রেরণ করেন এবং হযরত দিহইয়াকেও সেনাবাহিনীর সাথেই পাঠিয়ে দেন। হযরত যায়েদ (রা.) রাতের বেলা সফর করতেন এবং দিনের বেলা আত্মগোপনে থাকতেন। তাদের সাথে বনু উযরার একজন পথপ্রদর্শকও ছিল। অপরদিকে বনু জুযামের কিছু গোত্র একত্রিত হয়ে যায়। এদের মধ্যে গাতাফান গোত্রের সকলেই ছিল, ওয়ায়েল গোত্র ও সালামান গোত্রের কতক এবং সা'দ বিন হুযায়েম ছিল। রিফা'আ বিন যায়েদ (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর পত্র নিয়ে স্বজাতির নিকট এসেছিলেন তখন তারা হাররাতুল রাজলা নামক স্থানে ছিল। উল্লেখ্য, হাররাতুর রাজলা হলো জুযাম অঞ্চলে কালচে পাথুরে ভূমি আর রিফা'আ ছিলেন কুরায়ে রাবওয়া নামক স্থানে। কুরায়ে রাবওয়া সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে, এটি বনু জুযামের এলাকায় একটি স্থান ছিল। রিফা'আ (রা.) এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। বনু উযরার পথপ্রদর্শক হযরত যায়েদ বিন হারেসা এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের ভোরবেলা হুনায়েদ ও তার পুত্র এবং তাদের বসতিস্থলে হঠাৎ পৌঁছে দেন। সাহাবীরা তাদের ওপর আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেন আর অনেক রক্তপাত হয়। সেইসাথে হুনায়েদ ও তার পুত্রকেও হত্যা করেন আর তাদের গবাদিপশু, উট ও নারীদের করতলগত করেন। সেখানে এক হাজার উট এবং পাঁচ হাজার ছাগল ছিল। নারী ও শিশুদের মধ্যে একশজনকে বন্দি করা হয়।

এই আক্রমণের পর জুযাম গোত্রের শাখা বনু যুবায়েবের মদীনায় আগমনের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখনও যায়েদ (রা.) মদীনায় পৌঁছেন নি; বনু যুবায়েব গোত্রের লোকেরা, যারা ছিল বনু জুযামের শাখা– তারা যায়েদের এ অভিযানের সংবাদ লাভ করে। তারা তাদের নেতা রিফা'আ বিন যায়েদ (রা.)-র সাথে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মুসলমান হয়ে গিয়েছি আর আমাদের জাতির বাকি সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যারা মুসলমান হয় নি তাদের জন্যও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে; অথচ আপনার প্রেরিত সেনাদল আক্রমণ করে তাদের মধ্যে কতককে হত্যা করেছে, কতককে বন্দি করেছে আর গনিমতের সম্পদ সংগ্রহ করেছে। কিন্তু

আমরা তো মুসলমান হয়ে গিয়েছি আর তাদের ব্যাপারেও নিরাপত্তানামা রয়েছে। তাহলে এই হামলায় আমাদের গোত্রকে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হলো? আমাদের ওপর কেন আক্রমণ করা হলো? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, একথা সঠিক; [তিনি কোনো পাল্টাযুক্তি দেন নি।] তিনি (সা.) বলেন, তুমি ঠিক বলেছো, কিন্তু যায়েদ এ সম্পর্কে জানত না। এছাড়া যারা এই ঘটনায় নিহত হয়েছিল তাদের সম্পর্কে তিনি বারবার দুঃখ প্রকাশ করেন। তখন হযরত রিফা'আর সঙ্গী আবু যায়েদ (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! যারা নিহত হয়েছে তাদের ব্যাপারে আমাদের কোনো দাবিদাওয়া নেই; ভুল বোঝাবুঝির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কিন্তু যারা জীবিত আছে আর যায়েদ (রা.) আমাদের গোত্র থেকে যে সম্পদ করায়ত্ত করেছেন– তা আমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, একেবারেই সঠিক কথা। হাজার হাজার ভেড়া, উট ও ধনসম্পদ প্রভৃতি ও একশ বন্দিও ছিল। তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ হযরত আলী (রা.)-কে হযরত যায়েদের (রা.) নিকট প্রেরণ করেন এবং চিহ্ন হিসেবে তাকে নিজ তরবারি প্রদান করেন আর যায়েদ (রা.)-র কাছে এই বার্তা প্রেরণ করেন, সেই গোত্রের যেসব বন্দি ও সম্পদ করায়ত্ত করা হয়েছে সেগুলো যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। হযরত যায়েদ (রা.) এ আদেশ পাওয়ামাত্র সকল বন্দিকে মুক্ত করে দেন এবং গনিমতের মালও ফিরিয়ে দেন। (পরিমাণে তা) অঢেল সম্পদ ছিল। অপবাদ আরোপ করা হয় যে, গনিমতের মাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মুসলমানরা যুদ্ধ করতো। এটি এমন একটি দৃষ্টান্ত যার মাধ্যমে সেই মানের কথা জানা যায় যা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বর্তমানে তো মুসলমানরাই শত্রুতাবশত মুসলমানদের হত্যা করছে, অথচ এখানে শুধুমাত্র চুক্তিভুক্তদের সাথেও এমন সদ্‌ব্যবহার করা হয়েছে!

এরপর হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র আরেকটি সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সারিয়্যা ৬ষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে ওয়াদিউল কুরা বা কুরা উপত্যকায় সংঘটিত হয়েছে।

সারিয়্যা হিসমার প্রায় এক মাস পর এটি সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) পুনরায় যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে ওয়াদিউল কুরা অভিমুখে প্রেরণ করেন। ওয়াদিউল কুরা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, এটি মদীনার উত্তরে সিরিয়া অভিমুখে প্রায় ৩৫০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। একটি রেওয়ায়েতে আছে, এখানে **মাযহিজ ও কুযা** গোত্রের লোকেরা সমবেত ছিল এবং এটিও বলা হয়েছে যে, মুযার গোত্রের কিছু পরিবারও সেখানে সমবেত ছিল, কিন্তু যুদ্ধ হয় নি। কিন্তু ইবনে হিশাম বলেন:

কুরা উপত্যকায় বনু ফাযারা গোত্রের সাথে সাহাবীদের যুদ্ধ হয় এবং কয়েকজন সাহাবী শহীদ হন আর যায়েদ (রা.)-ও গুরুতর আহত হন, কিন্তু খোদা তা'লা তার (প্রাণ) রক্ষা করেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (সা.) পুস্তকে এ ঘটনার উল্লেখ করেন যে, যুদ্ধ হয়েছিল।

অতঃপর সারিয়্যা আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র উল্লেখ পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে **দুমাতুল জান্দালের** নিকটে এই যুদ্ধাভিযান পরিচালিত হয়। দুমাতুল জান্দাল মদীনার উত্তরে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী একটি স্থান, যা মদীনা থেকে প্রায় ৪৫০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত ছিল। ইবনে ইসহাক এবং মুহাম্মদ বিন উমর, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন খাত্তাব (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ করো; আমি তোমাকে আজ অথবা

আগামীকাল একটি অভিযানে প্রেরণ করতে যাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ্। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন:

এই সারিয়্যার প্রস্তুতি এবং যাত্রা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের বরাতে এই মজার রেওয়ায়েতটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার আমরা কয়েকজন ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপবিষ্ট ছিলাম, যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আব্দুর রউফ বিন অওফ (রা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এক আনসারী যুবক উপস্থিত হয়ে তাঁর (সা.) সমীপে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! মুমিনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? তিনি (সা.) বলেন, সেই ব্যক্তি যে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। এটিই মুমিনের পরিচয়, যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। [মহানবী (সা.)-এর সাথে] সাধারণ কথাবার্তাও হতো; যদিও সারিয়্যা বা বিভিন্ন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আলোচনা হতো, কিন্তু এ সময় বিভিন্ন উপদেশও দিয়েছেন যা আমাদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি (সা.) বলেন, সর্বোত্তম সে– যে চরিত্রের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম। সে বলে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সবচেয়ে অধিক মুত্তাকী কে? তিনি (সা.) বলেন, সে– যে মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি স্মরণে রাখে এবং এর জন্য সময় আসার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে। (সেই) প্রস্তুতি কী? (তা হলো) আল্লাহ্র ভয় থাকা, তাঁর প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা এবং তাঁর নির্দেশাবলি মেনে চলা। [এটিই হলো মৃত্যুর পূর্বপ্রস্তুতি।] একথা শুনে সেই আনসারী যুবক নীরব হয়ে যায়। এরপর মহানবী (সা.) আমাদের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে কিছু উপদেশ প্রদান করেন, হে মুহাজিরের দল! পাঁচটি এমন মন্দ বিষয় আছে যেগুলো থেকে আমি খোদার আশ্রয় প্রার্থনা করি আর সেগুলো যেন কখনো আমার উম্মতের মাঝে সৃষ্টি না হয় সেজন্যও (খোদার) আশ্রয় যাচনা করি। কেননা সেগুলো যে জাতির মাঝে দেখা দেয় তাকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

প্রথমত, যখনই কোনো জাতির মাঝে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে তারা তা প্রকাশ্যে করতে আরম্ভ করে– তখনই তাদের মাঝে এমন রোগব্যাধি ও মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটে যা তাদের পূর্বের লোকদের মাঝে ছিল না। [বর্তমান বিশ্বে আমরা এটি সর্বত্র দেখতে পাই। মহানবী (সা.) এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। মুসলমানদের বিশেষভাবে এটি নিয়ে চিন্তা করা উচিত।]

দ্বিতীয়ত, যখনই কোনো জাতিতে ওজন ও পরিমাপে দুর্নীতির অভ্যাস সৃষ্টি হয় তখন এর পরিণামস্বরূপ সেই জাতির ওপর দুর্ভিক্ষ, দুঃখকষ্ট, কাঠিন্য এবং সমসাময়িক শাসকের পক্ষ থেকে অত্যাচার নির্যাতনের বিপদ নেমে আসে। [এ সম্পর্কেও অনেক বেশি প্রণিধান করা উচিত। এখন তো মুসলমানের মাঝেও অনেক বেশি দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে। হায়! এটি যদি এটি বুঝতো। আহমদীদের বিশেষভাবে এই বিষয়ে প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত।]

তৃতীয়ত, যখনই কোনো জাতি যাকাত ও সদকা প্রদানে আলস্য ও ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে, তার ফলাফলস্বরূপ তাদের জন্য বৃষ্টির পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি যদি আল্লাহ্র নিজের সৃষ্ট জীবজন্তু ও গবাদি পশুর চিন্তা না থাকত তাহলে এমন জাতির ওপর বৃষ্টিপাত একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। [এটিও আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির লক্ষণ। এসব থেকেও (তাঁর) আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। মহানবী (সা.) বলেন, **তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা করো; আমিও আশ্রয় প্রার্থনা করি।**]

চতুর্থত, যখনই কোনো জাতি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে তাদের শত্রু জাতিগুলোর মধ্য হতে কোনো জাতিকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া

হয়েছে যারা তাদের অধিকার হরণ করা আরম্ভ করে। [বর্তমানে মুসলমানদের যে অবস্থা তা দেখলে সাব্যস্ত হয়, এরা নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গকারী। আল্লাহ্ তা'লা করুণা করুন এবং এদেরকে বোঝার শক্তি দিন।]

পঞ্চমত, যখনই কোনো জাতির আলেম-ওলামা এবং ইমামগণ শরীয়ত-বিরোধী ফতওয়া দিয়ে শরীয়তকে নিজেদের ইচ্ছামতো বিকৃত করার অপচেষ্টা করেছে তখনই এর ফলে তাদের মাঝে অন্তঃকলহ এবং বিতণ্ডার ধারা আরম্ভ হয়েছে। [বর্তমানে মুসলমানদের বিভিন্ন দলের ভেতর এটি সর্বত্র দৃষ্টিগোচর হয়। যেসব বিষয় থেকে মহানবী (সা.) আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন বর্তমানে সেগুলোই আমরা মুসলমানদের মাঝে দেখতে পাই। আল্লাহর তা'লা করুণা করুন।] মহানবী (সা.)-এর এই স্বর্ণালী বক্তব্য বিভিন্ন জাতির উন্নতি ও অধঃপতনের কারণগুলোর ওপর সর্বোৎকৃষ্ট আলোকপাত করে। আর মুসলমানরা চাইলে বর্তমান যুগেও এটি তাদের জন্য একটি চমকপ্রদ শিক্ষা হতে পারে। হায়! মুসলমানরা যদি এর প্রতি অভিনিবেশ করতো!

(এই) অভিযানে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও ঘটনাবলি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত আবদুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে রাতের বেলা দুমাতুল জান্দাল অভিমুখে যাত্রা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তার সৈন্যবাহিনী **জুরফ** নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে আর তারা ছিলেন প্রায় সাতশজন। **জুরফ** সম্পর্কে লেখা আছে, এটি মদীনা থেকে তিন মাইল উত্তরে অবস্থিত একটি স্থান ছিল। এই অভিযানের বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন:

এ পর্যায়ে ইসলামী প্রভাবের বলয় খুব দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছিল। আরবের দূর-দূরান্তের প্রান্তেও ইসলামের তবলীগ পৌঁছে যাচ্ছিল। কিন্তু এর পাশাপাশি দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলোতে বিরোধিতাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর যেসব মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো তাদেরকে তাদের গোত্রের লোকজনের পক্ষ থেকে চরম অত্যাচার-নিপীড়ন সহ্য করতে হচ্ছিল। আর এসব যুলুম-নির্যাতনের ভয়ে অনেক দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা করা থেকে বিরত থাকত। তাই যুদ্ধাভিযানের উদ্দেশ্যাবলিতে এটিও যুক্ত হয় যে, এমন সব গোত্রের প্রতি সেনাদল প্রেরণ করা হোক যাদের মধ্যে কিছু মানুষ মনেপ্রাণে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল কিন্তু অত্যাচার-নিপীড়নের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত। যদিও এসব দল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, যে বিষয়ে ইসলাম সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে মহানবী (সা.) ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে একটি সেনাদল হযরত আবদুর রহমান অওফ (রা.)-র নেতৃত্বে সুদূর দুমাতুল জান্দাল অভিমুখে প্রেরণ করেন। চতুর্থ হিজরীতে স্বয়ং মহানবী (সা.)-ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই জায়গায় গিয়েছিলেন। এভাবে অত্র অঞ্চল সে সময়ের দুই বছর পূর্বেই ইসলামের গণ্ডিভুক্ত হয়েছিল আর সেখানকার অধিবাসীরা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অপরিচিত ছিল না। বরং সম্ভবত তাদের একটি অংশ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাদের নেতা এবং গোত্রের লোকদের বিরোধিতার কারণে সাহস করতে পারছিল না। যাহোক, তিনি ষষ্ঠ হিজরী সনে একটি বড়ো সেনাদল জ্যেষ্ঠ সাহাবী আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র নেতৃত্বে দুমাতুল জান্দালের দিকে প্রেরণ করেন। তিনি (সা.) নিজের নৈকট্যপ্রাপ্ত সাহাবী আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ইবনে অওফ! আমি তোমাকে একটি যুদ্ধে (সারিয়্যাতে) আমীর বানিয়ে পাঠাতে যাচ্ছি, তুমি প্রস্তুত হও। পরদিন সকালে আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হলেন। তিনি (সা.) নিজ হাতে তাঁর পাগড়িটিই

তার মাথায় বেঁধে দিলেন এবং বেলালকে (রা.) তার হাতে একটি পতাকা তুলে দেবার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি (সা.) হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র অধীনে সাহাবীদের একটি দলকে নিযুক্ত করে তাদেরকে বললেন, হে ইবনে অওফ! এই পতাকা হাতে নাও এবং তোমরা সবাই খোদার পথে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড় এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করো। কিন্তু দেখো! কোনো বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না, কোনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না, শত্রুপক্ষের পুরুষদের লাশকে বিকৃত করবে না, তাদের শিশুদের হত্যা করবে না। এটি খোদার আদেশ এবং তাঁর নবীর সুন্নত।

এই রেওয়ায়েতে সম্ভবত বর্ণনাকারী ভুলবশত নারীদের উল্লেখ করে নি। নতুবা অন্যান্য স্থানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) যখন কোনো সেনাদল প্রেরণ করতেন তখন এটিও তাগাদা দিতেন, নারীদের হত্যা করবে না, বৃদ্ধ লোকদেরও হত্যা করবে না আর যাদের জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গিত তাদেরকেও হত্যা করবে না। এরপর তিনি আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে দুমাতুল জান্দালের দিকে যাত্রা করার এবং সন্ধির মাধ্যমে নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করেন। কেননা যদি তারা যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করে নেয় তাহলে সবচেয়ে উত্তম। তিনি (সা.) আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-কে বলেন, এক্ষেত্রে যদি তারা সম্মত হয় তাহলে তোমার জন্য তাদের নেতার মেয়েকে বিবাহ করা সমীচীন হবে। এরপর তিনি (সা.) এই সেনাদলকে বিদায় দেন এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) সাতশ সাহাবীকে নিয়ে দুমাতুল জান্দালের দিকে যাত্রা করেন। এটি আরবের উত্তরে তাবুক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। যখন এই ইসলামী সেনাদল দুমায় পৌঁছে তখন প্রথমে দুমার লোকদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত মনে হচ্ছিল। মুসলমানদেরকে তারা তরবারির ভয় দেখাচ্ছিল। কিন্তু আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) বুঝানোর পর তারা ধীরে ধীরে এই মনোবৃত্তি পরিহার করে। আর কিছুদিন পর তাদের নেতা আসবাগ বিন উমর কালবী, যে খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী ছিল, আব্দুর রহমান বিন অওফের তবলীগে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করে। তার সাথে তার জাতির অনেক লোক ইসলাম গ্রহণ করে, যারা সম্ভবত পূর্ব থেকেই ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। যারা নিজেদের ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাও সানন্দে ইসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। কাউকে বলপূর্বক বাধ্য করা হয় নি। অনেকেই ছিল যারা গ্রহণ করে নি, কিন্তু তারা রাষ্ট্রের আনুগত্যের অঙ্গীকার করে। এভাবে অত্যন্ত মঙ্গলজনকভাবে এই অভিযান সমাপ্ত হয় এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) দুমাতুল জান্দালের নেতা আসবাগ বিন উমরের কন্যা তামাযেরকে বিবাহ করে মদীনায় ফিরে আসেন। খোদার কৃপায় এবং মহানবী (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)-র ঘরে সেই তামাযেরের গর্ভে এমন এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, যিনি পরবর্তীতে ইসলামের সর্বোত্তম সেবক হন এবং জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সেই মার্গে উপনীত হন যে, নিজ যুগে তিনি ইসলামের প্রথম সারির আলেমদের মাঝে গণ্য হতেন। তার নাম ছিল আবু সালামা যুহরী।

আবু সালামা যুহরী সম্পর্কে ইবনে সা'দ লিখেছেন, **"কানা সিকাতান ফাকীহান কাসীরাল হাদীস"**। অর্থাৎ আবু সালামা একজন নির্ভরযোগ্য ফিকাহবিদ এবং বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন।

সাঈদ বিন আস বিন উমাইয়্যা যখন প্রথমবারের মতো মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ানের পক্ষ থেকে মদীনার গভর্নর নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি আবু সালামাকে মদীনার কাযী বা বিচারক নিযুক্ত করেন। আবু সালামা ৯৪ হিজরী সনে বাহাত্তর বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

ফাদাক অভিমুখে **হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের সারিয়্যার** বিবরণ; এই সারিয়্যা ৬ষ্ঠ হিজরীতে শাবান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে একশ লোকসহ ফাদাকে বনু সা'দ বিন বকর-এর প্রতি প্রেরণ করেন। ফাদাক সম্পর্কে লিখিত আছে, এটি মদীনা থেকে ছয় রাতের দূরত্বে অবস্থিত খায়বারের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। ৭ম হিজরীতে খায়বারের যুদ্ধে উক্ত অঞ্চল যুদ্ধ ছাড়াই বিজিত হয়। বর্তমানে এটি বড়ো একটি শহর যেখানে প্রচুর পরিমাণে খেজুর বাগান রয়েছে আর এটি চাষাবাদের জন্য বিখ্যাত। এখন এটিকে **আল-হায়েত** বলা হয়। মহানবী (সা.) সংবাদ পান, তারা একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করে রেখেছে আর তারা খায়বারের ইহুদীদের সাহায্য করতে চাচ্ছে। হযরত আলী (রা.) রাতের বেলা সফর করতেন আর দিনের বেলায় আত্মগোপন করতেন। সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে এর বিশদ বিবরণ এভাবে লিখিত রয়েছে:

নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণে মদীনায় ইহুদীদের ওপর যে ধ্বংসযজ্ঞ এসেছিল তা আরবের সমস্ত ইহুদীর হৃদয়ে কাঁটার মতো বিঁধছিল। আর **বনু কুরায়যার** যুদ্ধের পর যখন মদীনা একেবারে ইহুদীশূন্য হয়ে যায় তখন খায়বারের সেই জনপদ, যা হিজাজের ইহুদীদের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র ছিল, তা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আস্তানায় রূপান্তরিত হয়। আর এই স্থানের ইহুদীরা, যারা স্বভাবগতভাবে বিদ্বেষী, হিংসাপরায়ণ ও অত্যাচারী ছিল, তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য এবং মুসলমানদের নিশ্চি̣ করার প্রচেষ্টায় সব সময় সক্রিয় থাকত।

৬ষ্ঠ হিজরী সনের শাবান মাসে মহানবী (সা.) এ সংবাদ পেলেন যে, বনু সা'দ বিন বকর গোত্র এবং খায়বারের ইহুদীদের মাঝে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পারস্পরিক গোপন ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আর বনু সা'দ খায়বারের ইহুদীদের সাহায্যার্থে নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করছে। এই সংবাদ পাবার অনতিবিলম্বে মহানবী (সা.) হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে সাহাবীদের একটি দল প্রেরণ করেন যারা দিনের বেলায় লুকিয়ে আর রাতের বেলায় সফর করে ফাদাকে পৌঁছে, যার পাশেই এই লোকেরা একত্রিত হচ্ছিল। সেখানে মুসলমানরা একজন বেদুইন ব্যক্তি দেখতে পেল যে মূলত বনু সা'দের গোয়েন্দা ছিল। হযরত আলী (রা.) তাকে গ্রেফতার করেন আর তার কাছে বনু সা'দ এবং খায়বারবাসীর খবরাখবর জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে তো সে পুরো অজ্ঞতা এবং তাদের বিষয়ে না জানার ভান করে, কিন্তু পরিশেষে সে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি আদায় করে সমস্ত গোপন খবরাখবর প্রকাশ করে দেয়। অতঃপর মুসলমান সৈন্যদল সেই ব্যক্তিকে নিজেদের পথপ্রদর্শক বানিয়ে সেই স্থানের দিকে রওয়ানা হয় যেখানে বনু সা'দ একত্রিত হচ্ছিল আর তারা (মুসলমানরা) অতর্কিত আক্রমণ করে বসেন। এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে বনু সা'দ বিচলিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে আর হযরত আলী (রা.) মালে গনিমত করায়ত্ত করে মদীনায় ফেরত আসেন। আর এভাবেই এই বিপদ সাময়িকভাবে টলে যায়।

এরপর রয়েছে **সারিয়্যা আবু বকর**-এর বর্ণনা যা **বনু ফাযারা** অভিমুখে পরিচালিত হয়। এই সারিয়্যা বা যুদ্ধাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরী সনে সংঘটিত হয়। বনু ফাযারা **নাজদ** অঞ্চলের ওয়াদিউল কুরায় বসবাস করত আর ওয়াদিউল কুরা মদীনার উত্তরে সিরিয়ার দিকে প্রায় সাড়ে তিনশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। তাবাকাতুল কুবরা এবং সীরাত ইবনে হিশাম-এ লেখা আছে, এ অভিযান হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু সহীহ মুসলিম এবং সুনান আবু দাউদ থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) এই অভিযানের আমীর হিসাবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে নির্বাচিত করেছিলেন। যেমন সহীহ মুসলিমের

রেওয়ায়েতে আছে, আইয়াস বিন সালামা বর্ণনা করেন, আমার পিতা হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেছেন, আমরা ফাযারা গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি এবং আমাদের আমীর ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। মহানবী (সা.) আমাদের জন্য তাঁকে (রা.) আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আমরা যখন পানি থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে ছিলাম, [অর্থাৎ সেখানে কুয়া ইত্যাদি বা পানির জায়গা একঘণ্টা দূরত্বে ছিলেন;] তখন হযরত আবু বকর (রা.) নির্দেশ দিলে আমরা রাতের শেষ প্রহরে পানির স্থান থেকে এক ঘণ্টার দূরত্বে শিবির স্থাপন করলাম। অতঃপর আমরা এবং তারা সেই পানির স্থানে পৌঁছলাম আর তিনি অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) সবদিক থেকে আক্রমণ রচনা করেন। কিছু লোককে হত্যা করেন আর অনেককে বন্দিও করেন। আর আমি মানুষের সেসব দলকে দেখছিলাম যাদের মাঝে শিশু ও মহিলারা ছিল। আমি এই ভয়ে ভীত হই যে, তারা আমার পূর্বে না পাহাড়ে আরোহণ করে বসে। অর্থাৎ সাথে যে সাহাবীরা ছিল তাদের কথা বলছেন, আশঙ্কা ছিল পাছে এ লোকেরা দৌড়ে আবার পাহাড়ে চড়ে বসে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি তখন তাদের এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তির নিক্ষেপ করি; তির নিক্ষেপ করতে থাকি যেন তারা ভয়ে পিছু হটে যায়। তারা যখন তির দেখে তখন থেমে যায়। আমি তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাই। তাদের মাঝে বনু ফাযারার একজন মহিলা ছিল যে পুরানো কাপড় পরিহিত ছিল এবং তার সাথে তার মেয়ে ছিল যে খুবই সুন্দরী ছিল। আমি তাদেরকে ঘিরে হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে নিয়ে আসি। হযরত আবু বকর (রা.) তার মেয়েকে উপহার হিসেবে আমায় প্রদান করেন। আমরা মদীনায় ফিরে আসি। মহানবী (সা.) এই মেয়েকে মক্কাবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। [হযরত আবু বকর (রা.) তো তাকে দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.) তাকে ফেরত নিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন যেন তার বিনিময়ে অনেক মুসলমানকে মুক্ত করা যায়, যারা মক্কায় বন্দি অবস্থায় ছিল।] এটি সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত। এই অভিযানে মুসলমানদের সংকেত বা কোড ওয়ার্ড ছিল **'আমিত! আমিত!'**

হযরত সালামা বিন আকওয়া বর্ণনা করেন, আমি সেই দিন নিজ হাতে সাতজনকে হত্যা করি। আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী নয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই। প্রথমজন হলেন মুকাররম তৈয়ব আহমদ সাহেব বাঙালি, যিনি কাদিয়ানের দরবেশ ছিলেন। তিনি ১১ ডিসেম্বর তারিখে ৯৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। তাঁর জন্ম বাংলাদেশে হয়েছিল। ১৯৪২ সালে তিনি ঢাকায় রীতিমতো ফর্ম পূরণ করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি প্রথমবার কাদিয়ান জলসায় যোগদান করেন এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন। কাদিয়ানের প্রতি হৃদয়ে এতটা ভালোবাসা জন্মায় যে, তিনি আর নিজের দেশে ফেরত যান নি। তিনি কাদিয়ানে থেকে দুই বছর দেহাতী মুবাল্লেগীনের বিশেষ ক্লাসে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের সেই দিনগুলোতে দেশ বিভাগের ঘটনা ঘটে আর তিনি কাদিয়ানে থাকার আবেদন জানান, যা মঞ্জুর করা হয়। দরবেশী জীবনে তিনি বিভিন্ন স্থানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার বিভিন্ন দপ্তরে তিনি বিভিন্ন ধরনের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ৫৫-৫৬ সালে জামা'তের আর্থিক অবস্থা দুর্বল ছিল। সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কাদিয়ান এই ঘোষণা দেয়, যে–সব দরবেশ কোনো কাজ করে নিজে আয়-উপার্জন করতে সক্ষম তাদের উচিত কোনো না কোনো জীবিকার সন্ধান করা, কেননা জামা'ত তাদের ভাতা

প্রদান করতে এবং এহেন অবস্থায় তাদের আর্থিক ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম। এই নির্দেশের অধীনে তিনি দারুল মসীহ্‌র বাইরে বাজারে একটি চায়ের দোকান দেন আর অধিকাংশ সময় মেহমানদের এবং গরিবদের তিনি বিনামূল্যে চা পান করাতেন।

তার বিয়ে কেরালার এক তালাকপ্রাপ্তা নারী আমেনা সাহেবার সাথে হয়েছিল। তার পূর্বের ঘরে এক কন্যা ছিল। সেই কন্যাকে তিনি লালনপালন করেছেন। কিছুকাল পূর্বে তার হাঁটুতে ভীষণ যন্ত্রণা দেখা দেয় আর চলাফেরা দুষ্কর হয়ে ওঠে। ডাক্তাররা তাকে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ প্রদান করেন (কিন্তু) তিনি তা গ্রহণ করেন নি বরং ভীষণ আহাজারি, কাকুতিমিনতি ও ব্যাকুলতার সাথে দোয়া করতে থাকেন। তিনি বলেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসেন এবং বেহেশতি মাকবেরার কিছু লতাপাতা (আমাকে) খাওয়ান। তিনি বলেন, এরপর ধীরে ধীরে হাঁটুর যন্ত্রণা দূর হয়ে যায় আর নিজ বাসনা অনুসারে পুনরায় নিয়মিত নামায আদায় করতে মসজিদে আকসা ও মসজিদে মোবারকে যাওয়া আরম্ভ হয়। খিলাফতের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ও ভালোবাসা ছিল। খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ ছিল বিধায় যুবকদের সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। খেলার মাঠে এসে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন। এভাবে শিশুদের তরবিয়তও হয়ে যেত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র নির্দেশ অনুযায়ী দেশ বিভাগের সময় ৩১৩জন দরবেশ কাদিয়ানে অবস্থান করেন। তিনি সেই দরবেশদের মাঝে সর্বশেষ দরবেশ তিনি ছিলেন আর তিনিও চলে গেলেন। এখন কাদিয়ানে আর কোনো দরবেশ জীবিত নাই। আজ থেকে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত এটি প্রথম জলসা– যা কোনো দরবেশের অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখন কাদিয়ানে বসবাসকারী নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব হলো, এই কুরবানীকারী বুযুর্গদের আদর্শ অব্যাহত রেখে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সাথে কাদিয়ানে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়া পাকিস্তানের সদর মির্যা মুহাম্মদ দ্বীন নায সাহেবের। তিনি মির্যা আহমদ দ্বীন সাহেবের পুত্র ছিলেন। সম্প্রতি তার ইন্তেকাল হয়েছে; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার পরিবারে আহমদীয়াতের গোড়াপত্তন তার পিতার মাধ্যমে হয়েছে। তিনি একজন আহমদী পাটওয়ারী হাশমত উল্লাহ্ সাহেবের তবলীগে ১৯৪২ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ দ্বীন সাহেবের বিয়ে সৈয়্যদ আব্দুল হাদী সাহেবের কন্যা সৈয়্যদা নুসরত জাহাঁ সাহেবার সাথে হয়েছে। তার একজন ছেলে ছিল, সে যুবক বয়সে মৃত্যু বরণ করে। এরপর তিনি একজন ভাগ্নে ও একজন ভাগ্নিকে লালনপালন করেন এবং সন্তানের মতো তাদেরকে লালনপালন করেন। ভাগ্নেও অসুস্থ; আল্লাহ্ তা'লা তাকেও আরোগ্য দান করুন।

১৯৬৫ সালে তিনি জামেয়া আহমদীয়াতে ভর্তি হন। বিএ ডিগ্রি অর্জন করেন, কিছুকাল বাইরে চাকরিও করেন। এরপর জামেয়াতে ভর্তি হন। জামেয়াতে ভর্তি হয়ে ১৯৭১ সালে জামেয়া পাশ করার পর তার প্রথম পদায়ন ফিল্ডে হয়। এরপর তাকে জামেয়ার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হয়। সারাফ ও নাহাভ (অর্থাৎ আরবি ব্যাকরণ) পড়াতেন। সাহিত্য, ফিকাহ্, ইতিহাস ও তাসাউফও পড়িয়েছেন। জামেয়াতে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবেও সেবা প্রদানের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। ৩৭ বছর পর্যন্ত তার জামেয়াতে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়। এরপর এডিশনাল নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ, তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী হিসেবে তার নিযুক্তি হয়। এরপর ২০১৮ সালে তাকে আমি সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

সদর নিযুক্ত করি। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই পদেই তিনি বহাল ছিলেন। কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্‌তেও তার যথেষ্ট সেবা করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। আনসারুল্লাহ্‌র সফে দওম-এর সদরও ছিলেন। মাসিক খালিদ এবং মাসিক আনসারুল্লাহ্‌র সম্পাদকও ছিলেন। ১৯৯৪ সালে প্রায় এক মাসের অধিক বা সোয়া মাস পর্যন্ত তার 'আসীরে রাহে মওলা' বা খোদার খাতিরে কারাবরণের সৌভাগ্যও হয়েছে। দারুল কাযায় কাযা বোর্ডের সদস্য হিসেবে সেবা প্রদান করছিলেন। মজলিসে ইফতার সদস্য ছিলেন। ফিকাহ্‌ সম্পাদনা কমিটির সদস্য ছিলেন। বুয়ূতুল হামদ-এর সেক্রেটারি ছিলেন। আরবী বোর্ডের প্রধানও ছিলেন। আরবীর গভীর জ্ঞান রাখতেন। তার সহধর্মিণী বলেন, আমি একথার সাক্ষী– তার সম্পূর্ণ জীবনের সারকথা হলো, "ভালোবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে"।

তার এক ভাতিজা বলেন, মির্যা নায সাহেব আমাকে বলেছিলেন, আমার স্মরণ আছে, দশ বা বারো বছর বয়স থেকে আমি তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করি যা আজ পর্যন্ত কোনো অসুস্থতা বাদ না সাধলে নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করে আসছি। একইভাবে দশ বা এগারো বছর বয়স থেকে আমি বাজামা'ত নামায পড়া আরম্ভ করি আর এই অভ্যাস ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা অথবা কোনো অসুস্থতা ব্যতীত সর্বদা মসজিদে গিয়ে বাজামা'ত নামায আদায় করি।

তার আরেক আত্মীয় বলেন, আমি তার সাথে একবার এক রাত অতিবাহিত করি। প্রচণ্ড শীতের রাত ছিল। রাত অনেক দীর্ঘ ছিল। আমি দেখেছি, রাতে উঠে তিনি প্রায় চার ঘণ্টা ক্রমাগত তাহাজ্জুদ পড়েন এবং তিনি বলতেন, শীতের দীর্ঘ রাতে দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদ পড়া উচিত। তিনি আরো বলেন, [মির্যা সাহেব তার মামা ছিলেন,] দুই রাকআত নফল পড়া সম্পর্কে বলেছেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রাহে.)-র যুগে আরম্ভ করি আর এখন পর্যন্ত ধারাবহিকভাবে আমল করে যাচ্ছি।

এখানে জলসায় আসতেন, গভীর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতেন। এখানে [আমার সাথে] সাক্ষাৎ করতেন আর সর্বদাই আমি তার চোখে হৃদ্যতা ও ভালোবাসা দেখেছি এবং আনুগত্যের উন্নত মান দেখেছি। এখানে আসলে তাকে কেউ বাসায় নিতে চাইলে বা দাওয়াত দিলে তিনি এই শর্ত দিতেন, আমি খলীফাতুল মসীহ্‌র পিছনে বাজামা'ত নামায আদায় করব। যদি নামাযের পূর্বেই আমাকে পৌঁছে দিতে পারো তাহলে তোমার সাথে যেতে পারি, অন্যথায় যাব না।

তার ভাই মোশতাক বেগ সাহেব এখানে (যুক্তরাজ্যে) থাকেন। তিনি বলেন, পিতার ইচ্ছায় আমার ভাই নিজের জীবন জামা'তের জন্য উৎসর্গ করেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি বিএ পাশ করেছিলেন কেননা উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেই তিনি জীবন উৎসর্গ করতে চাইতেন। জামেয়া আহমদীয়া থেকে পাশ করার পর মিশরের এক বিশ্ববিদ্যালয় তাকে খুব ভালো একটি চাকরির প্রস্তাব দেয় এবং খুব ভালো বেতন দেবার প্রস্তাব দেয়; কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেন এবং বলেন, আমি আমার জীবন আল্লাহ্‌ তা'লার পথে উৎসর্গ করেছি। এটি সেই সময়ের কথা যখন তার ভাতা অর্থাৎ মুরব্বীদের ভাতা কেবল চল্লিশ রুপি ছিল এবং অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো।

জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ার প্রিন্সিপাল মুবাশ্বের আইয়ায সাহেব তার কর্তব্য দায়িত্বশীলতার সাথে সম্পন্ন করার একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, আমরা সানিয়া বা সালেসাতে পড়তাম। নায সাহেব আমাদের আরবী পড়াতেন। সেই সময় তার এক বোন সম্ভবত ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছিল,

তিনি দুরারোগ্য। জামেয়া কমপাউন্ডে তিনি তার কাছেই থাকতেন। একদিন তাকে (বোনকে) রক্ত দিতে হয়। রক্ত দিয়ে জামেয়াতে ক্লাস নিতে চলে আসেন, ক্লাস মিস দেন নি। সেই সময় তার বোন মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তিনি (আইয়ায সাহেব) বলেন, ক্লাসে আমাদের পড়াচ্ছিলেন; এমন সময় তার এক আত্মীয় আসে আর ক্লাস রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে ডেকে নায সাহেব তার কথা শুনে পুনরায় ফিরে আসেন এবং আমাদের পড়ানো আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, সেদিন তিনি আমাদের একটি আরবী কবিতা পড়াচ্ছিলেন যাতে বেদনাদায়ক পঙ্‌ক্তিও ছিল। সেই পঙ্‌ক্তিগুলো পড়াতে গিয়ে নায সাহেবের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে ওঠে এবং চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তিনি বলেন, সেই সময় আমরা আশ্চর্য হলাম যে, নায সাহেব তো খুবই সাহসী মানুষ! কিন্তু তার এই অবস্থা কেন হলো? যাহোক, তিনি ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে ক্লাসের পুরোটা সময় পড়ান এবং ক্লাস শেষ হওয়ামাত্র তড়িঘড়ি করে ক্লাস থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়িতে চলে যান। পরে জানা যায়, যে ব্যক্তিটি তার সাথে ক্লাসের বাইরে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন তিনি তার নিকটাত্মীয় ছিলেন যিনি তার বোনের স্বাস্থ্যের অবনতি সম্পর্কে সংবাদ দেবার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু নায সাহেব নিজের আবশ্যকীয় কর্তব্যকে প্রাধান্য দান করেন এবং পাঠদান শেষ করে গিয়েছিলেন এবং খুব সম্ভব এর কিছুক্ষণ পরই তার সেই বোন পরলোক গমন করেন।

তিনি অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। একজন ওয়াকফে যিন্দেগীর দায়িত্ব তিনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। খিলাফতের সাথে অশেষ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল তার। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

তৃতীয় স্মৃতিচারণ হলো মুকাররম আকমুরাত খায়কিভ সাহেবের। তিনি তুর্কমেনিস্তান জামা'তের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি সম্প্রতি মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ডাক্তার আব্দুল আলীম সাহেব এবং রাভীল বুখারী সাহেবের মাধ্যমে তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন। তাদের দুইজনের সম্মিলিত তবলীগে তিনি বয়আত করেন। যদিও তিনি মনেপ্রাণে পূর্বেই আহমদী ছিলেন কিন্তু (তখন পর্যন্ত) বয়আত করেন নি। ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করেন আর এখানে আমার সাথে সাক্ষাৎ করার পর আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং যুগ খলীফার হাতে বয়আত করতে পেরে তিনি আনন্দিত ছিলেন।

পত্র লেখক বলেন, বয়আতের শব্দগুলো যখন পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিল, তখন নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানে দৃঢ়তার কারণে তার মুখায়বের চিত্র এমনভাবে পাল্টে যাচ্ছিল যে, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না ইনি সেই আকমুরাত সাহেব যিনি কিছুক্ষণ পূর্বেই আমাদের সাথে হাসতে হাসতে কথা বলছিলেন। কয়েক বছর পূর্বে তুর্কমেনি ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজ তিনি আরম্ভ করেন এবং গত বছর সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। গত বছর ইউকে সালানা জলসায় অংশগ্রহণের পর তিনি আমার কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেন, এখানে আমি আরো কিছুদিন অবস্থান করতে ইচ্ছুক। আমার অনুমতিপ্রাপ্তির পর তিনি এখানে অবস্থান করেন। এখানে থাকাকালে তিনি নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, এছাড়াও রাশিয়ান ডেস্কের সহায়তায় কুরআন অনুবাদকে গ্রন্থাকারে প্রস্তুত করেন।

আকমুরাত সাহেব কেবল তুর্কমেনিস্তানের প্রথম আহমদী ছিলেন এমনটি নয়, বরং আমৃত্যু জামা'তে আহমদীয়া তুর্কমেনিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। তিনি একটি সাক্ষাৎকারে লেখেন, আমি জন্মগত মুসলমান ঠিকই, তবে আমি

একজন প্রথাগত মুসলমান ছিলাম। সেটি সোভিয়েত ইউনিয়নের যুগ ছিল, আমি সমাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলাম। কিন্তু বিশেষ ইসলামী মূল্যবোধ তখনও আমাদের মাঝে সুরক্ষিত ছিল। আমি গণিত নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম, কিন্তু মূলত আমি সর্বদা খোদাকে অন্বেষণ করতাম– 'খোদা কে? আল্লাহ্ তা'লা নাকি পৃথক কোন সত্তা?' এটি ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ, তবে আমি খোদকে অন্বেষণ করতাম। কুরআনের কিছু আয়াতও আরবীতে আমার মুখস্ত ছিল। তিনি বলেন, নিজ পিতার মৃত্যুর পর আমি একটি স্বপ্নে দেখি, একজন সম্মানিত বুযুর্গ ব্যক্তি আসেন যিনি ধবধবে সাদা পোষাক পরেছিলেন। সেই কাপড়টি এতই চোখ ধাঁধানো সাদা ছিল যে সেটা বর্ণনা করার মতো না। তিনি বলেন, সেই আগমনকারী বুযুর্গ ব্যক্তি হাতের ইশারায় আমাকে নিজের নিকটে ডাকেন এবং তিনি মুখে কিছুই বলেন নি, কেবলমাত্র তার কাছে যাওয়ার জন্য আহ্বান করেন (অর্থাৎ আমার কাছে আস)। তিনি বলেন, এটি ২০০১ সালের কথা। এরপর রাভীল সাহেব এবং ডাক্তার আব্দুল আলীম সাহেবের তবলীগের মাধ্যমে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কথা জানতে পারেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ছবি তাকে দেখানো হলে তিনি বলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি স্বপ্নে আমাকে নিজের কাছে ডেকেছিলেন। এভাবে তিনি আহমদীয়াতের সত্যতা স্বীকার করেন আর যেভাবে আমি বললাম, ২০১০ সালে এসে বয়আতও গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমার হৃদয়ে আবেগের যে স্ফুরণ ঘটছে, আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে অপারগ। কেননা সেই জ্যোতি যা আহমদীয়াত আমাকে দিয়েছে, তা আমার হৃদয় যতটা উপলব্ধি করছে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

অনেক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনকারী ছিলেন এই ব্যক্তি। তিনি বলেন, প্রত্যেক খুতবা, প্রত্যেক বক্তৃতা আমার হৃদয় এবং আমার আত্মা ছুঁয়ে যায়। এত মনোযোগ দিয়ে শুনি যে, মুখস্ত হয়ে যায়। তিনি আরো বলেন, আমি মনে করি, পৃথিবীর স্থায়িত্ব এবং জগতের সব মানুষের অধিকার সমানভাবে প্রদান করা আজ আহমদীয়া জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত।

এখানে গত বছরের জলসা সালানার পর অবস্থান করাটা তার জন্য সহজ ছিল না। তিনি বলেন, তুর্কমেনিস্তানে আমার পরিবারে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে যেখানে আমার সকল আত্মীয়স্বজন উপস্থিত রয়েছে। ঘরের কর্তা হিসেবে আমার সেখানে থাকার কথা; কিন্তু আমি মনে করি, এ সময় কুরআন করীমের তুর্কমেনি অনুবাদের কাজের চেয়ে আমার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো কাজ নেই। আমার কাছে কুরআন করীমের সেবা করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও কৃপা করুন। তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানদেরকেও আহমদীয়াত কবুল করার এবং তদনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য দিন যদি তারা বয়আত না করে থাকেন।

নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)